মুক্তিযুদ্ধের দেশি ও বিদেশি বন্ধুরা

মামুন আজ ক্লাসে এসে ওর বন্ধুদের বলল সে এবার ইদের বন্ধে মা বাবার সাথে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। জাদুঘরে তারা মাদার তেরেসাসহ আরো কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ সাংবাদিক, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ বা সমাজকর্মী ছিলেন।

মিলি বলল, তাই নাকি! তোমার কথা শুনে আমারও তাদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় খুশি আপা ক্লাসে প্রবেশ করে তাদের কাছে জানতে চাইলেন তারা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে।

মিলি বলল, আপা মামুন এবারের ছুটিতে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে ও অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখেছে, যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ওর কথা শুনে আমাদেরও সে সব বিখ্যাত মানুষ দেখতে ইচ্ছা করছে।

খুশি আপা বললেন, তাই! তাহলে চলো আমরা এ রকম কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবি দেখি।

 সাইমন ড্রিং	 শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
 মাদার তেরেসা	 লিওনিদ ব্রেজনেভ

 শরণার্থী শিবিরে এডওয়ার্ড কেনেডি	 জর্জ হ্যাঁরিসন
 পন্ডিত রবিশংকর	 তাজউদ্দীন আহমদ

খুশি আপা যখন শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন ছবির ব্যক্তিদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী তখন দেখা গেল ওরা আন্দাজ করে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারলেও বিস্তারিত তেমন কিছু জানে না।

খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে এসব বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে থেকে একজনের সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। তার নাম সাইমন ড্রিং। উনি পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক ।

সাইমন ড্রিং: বাংলাদেশের বন্ধু

সাইমন ড্রিংকে বলা হয় বাংলাদেশের একজন ‘প্রকৃত বন্ধু’

১৯৭১ সালে সাইমন ড্রিং ২৬ বছরের একজন তরতাজা তরুণ সাংবাদিক। ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের গণতন্ত্রে উত্তরণের সংকট কীভাবে সমাধান হচ্ছে তার খবর সংগ্রহ করতে। আরও বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।

কিন্তু পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানিরা সব বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পাকিস্তানি সামরি কর্মকর্তারা পাহারা দিয়ে তাদের বিমান বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছিল। তরুণ সাইমন আচঁ করতে পেরেছিলেন যে ঢাকায় বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, যা সরকার বিদেশিদের কাছে গোপন করতে চায়। তখনই তিনি ঠিক করলেন যেভাবে হোক খবরটা তার সংগ্রহ করতে হবে।

পাকিস্তানি সামরিক সদস্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ড্রিং ৩২ ঘণ্টার বেশি সময় হোটেলে লুকিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই পাকিস্তানের হিংসাত্মক ঘটনার খবর তিনি বিশ্ববাসীকে জানাবেন। ২৭ ঘণ্টা পরে যখন কারফিউ বা সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হয় তখন তিনি রাস্তায় টহলরত মিলিটারির চোখ এড়িয়ে পথে নামলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পুরোনো ঢাকার কিছু জায়গা থেকে তিনি গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ছবি তুললেন, খবর সংগ্রহ করলেন।

তাঁর আসল কাজ তো হলো, এবার অবরুদ্ধ দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোতে হবে, কারণ খবরটা তো বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। নানা কৌশলে, এমনকি তথ্য টুকে রাখা কাগজ, ছবির নেগেটিভ মোজার মধ্যে লুকিয়ে রেখে.কোনো মতে বিমানে উঠে অবরুদ্ধ দেশ ছেড়ে সাইমন ব্যাংকক পৌঁছান।

ব্যাংকক থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন ‘পাকিস্তানে ট্যাংকের নিচে বিদ্রোহ দমন’ শিরোনাম পাঠিয়ে দেন তাঁর পত্রিকা লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে। এটি ২৯ মার্চ প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটির শুরুর বাক্য ছিল এ রকম ‘সৃষ্টিকর্তা এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে ঢাকা আজ বিধ্বস্ত ও ভয়ার্ত এক শহর। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঠান্ডা মাথায় বর্বরভাবে কামানের গোলার আঘাতে ঢাকায় এক রাতে অন্তত ৭০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, বিশাল বিশাল এলাকার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ’

সে রাতের পরে প্রেতপুরির মতো বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ, স্তুপিকৃত লাশের এক শহর দেখে তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তখনকার মতো শেষ। কিন্তু এই খবর এবং তার সাথের ছবিগুলো বিশ্ববাসীর কাছে এই বাংলায় পাকিস্তানিদের চালানো ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বারতা দিয়েছিল। এটি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

সাইমন ড্রিং সারা জীবনে ভিয়েতনাম যুদ্ধসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ২০টি যুদ্ধ ও বিপ্লবের খবর সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপিয়ে ছিলেন, টিভিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। ২০২১ সালে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইমনের কাহিনী শেষ করে খুশি আপা বললেন, এ তো একজন সাইমনের কথা হলো। নয় মাসজুড়ে আরও অনেক সাংবাদিক যুদ্ধের সময়কার খবর পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টিভি ও রেডিওতে।

এমন সময় ক্লাসের একটু চুপচাপ মেয়ে নীলা বলল, কিন্তু কেবল কি বিদেশি সাংবাদিকরাই আমাদের পক্ষে কাজ করেছিল?

খুশি আপা একটু রহস্য করে হেসে বললেন, তোমাদের কী মনে হয়?

ওরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আপার দিকেই তাকিয়ে থাকল।

খুশি আপা হেসে বললেন, দেশি সাংবাদিকরাও দু:সাহসী কাজ করেছেন।

রবিন জিজ্ঞেস করল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কি সারা বিশ্বেই আলোড়ন ফেলেছিল?

খুশি আপা মাথা নেড়ে বললেন, আমরা একা ছিলাম না। তাছাড়া বিশ্বের একটা অঞ্চলে যুদ্ধ বাধলে পাশের দেশ তো চুপ থাকতে পারে না। এমনকি মানবিক সংকট হলেও তারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

ওদের এ আলোচনায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর -UNHCR), সেভ দ্য চিলড্রেনসহ আরও কিছু কিছু বিদেশি ও দেশি সংস্থার নাম উঠে আসে। তবে আপা ওদের জানাতে ভুললেন না যে এ রকমই এক কঠিন দু:সময়ে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি বা মানবতার জননী শিরোপা পেয়েছেন।

যুদ্ধের আরও ফ্রন্ট

খুশি আপা বললেন, তাহলে দেখো যুদ্ধ শুধু সৈনিকরাই করেন না, কেবল অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ হয় না। কেবল রণাঙ্গণেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকে না।

মিলি বলল, আপা সাইমন ড্রিং যেমন তার সংগ্রহ করা খবর লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফপত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন তেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আরো অনেক গণমাধ্যমও ছিল।

কণক বলল আমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা একটি বই পড়েছিলাম। ওখানে বিবিসি ও আকাশবাণীর নাম পেয়েছিলাম।

এবারে খুশি আপা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন যুদ্ধের অন্যান্য ফ্রন্টের নাম।

মিলি বলল, 'বিবিসি, আকাশবাণী।

ফ্রান্সিস শুধরে নিয়ে বলল' সংবাদপত্র ও বেতার-টিভি মিলিয়ে বলা যায় গণমাধ্যম।

এভাবে খুশি আপার সাহায্য নিয়ে ওরা সম্ভাব্য ফ্রন্টের একটা তালিকা তৈরি করবে।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ কণক। দেখো, যুদ্ধ দুই দেশের মধ্যে বাধলেও উভয় পক্ষেই আরও বন্ধুরাষ্ট্রের সমর্থন সাহায্য প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ বা সমস্যা যদি বড় আকারের হয় তখন তার রেশ অঞ্চল ছাপিয়ে বিশ্বেও প্রভাব ফেলে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তেমন একটি ঘটনা ছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দও চেয়েছেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বন্ধুরাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়াতে।

এ সময় আনুচিং বলল, আমি শুনেছি জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

নন্দিনী বাবার কাছে শোনা একটি কথা বলে খুশি আপাকে তাক লাগিয়ে দিল। বলল এ হলো কুটনৈতিক যুদ্ধ।

আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ তুমি, বহু দেশ এবং বহু মানুষের সহযোগিতাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি। এখানে কুটনীতি এবং রাজনীতি উভয়েরই ভূমিকা আছে।

তখন হারুন একটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করল। ও বলল আমি শুনেছি চীন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু কেন?

ফ্রান্সিস ও সালমা বলল, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কেবল আমাদের দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক মানুষ, অনেক প্রতিষ্ঠান এতে যুক্ত হয়েছিল।

এবারে আদনান বলল, এতসব আমরা জানব কীভাবে? রনি বলল, আমরা মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক খবর, বৈশ্বিক খবর, বিভিন্ন ফ্রন্টের খবর সবই জানতে চাই। চলো এ বিষয়ে একটা প্রকল্পমূলক কাজ করা যাক।

খুশি আপা বরাবরই হাসিখুশি মানুষ আর শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। উনি এবার বললেন, তোমরা হলে এক একজন খুদে গবেষক। রীতিমত গবেষকের মতো কাজ করবে তোমরা। যখন সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করি কিংবা কোনো জটিল চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন/বিষয়ের উত্তর খুঁজি তখন প্রকল্পভিত্তিক কাজ করাই ভালো। সাধারণত এ ধরনের কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। এভাবে অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে যেমন তথ্য জানা যায় তেমনি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন/প্রশ্নসমূহের জবাব পাওয়া যায়। আর এভাবে এমন একটা প্রতিবেদন তৈরি হয়ে ওঠে যাতে সব দিকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবার স্পষ্ট ধারণা হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা এ ধরনের কাজের ধাপগুলো সম্পর্কে জেনেছ। সেটা মনে করে বা আরেকবার পড়ে নিয়ে কাজের ধাপগুলো ঠিক করে নাও।

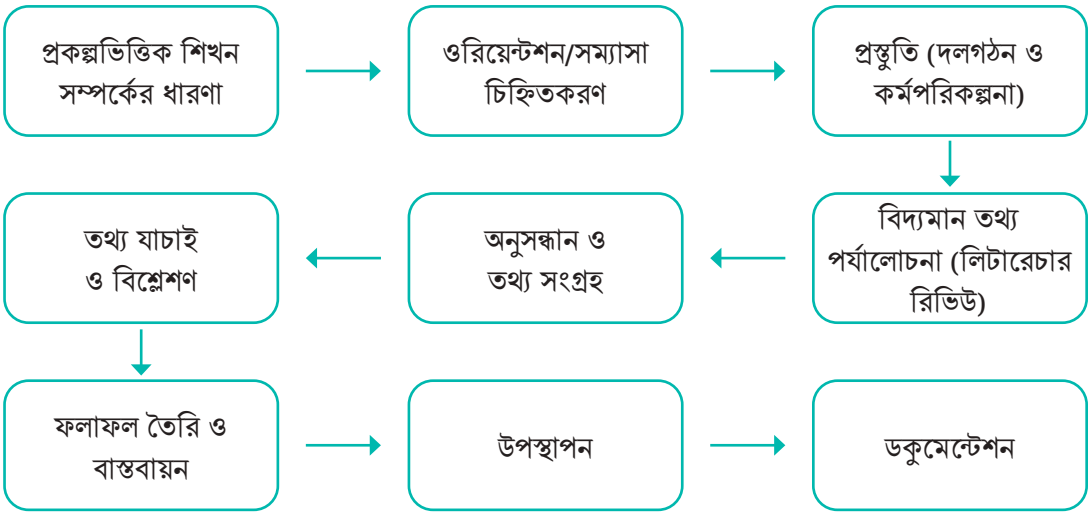

চলো, আমরাও ওদের মতো করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যারা বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তাদের কথা জেনে নিই।

এবারে খুশি আপা প্রকল্পে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা তাদের আলোচনা করে বের করতে বললেন। আলোচনার মাধ্যমে তারা প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা তৈরি করল।

আনাই ও তার দলের তালিকা:

১. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)
২. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, (গণমাধ্যম)
৩. শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা। (মানবিক সহায়তা)
৪. প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক। (রাজনীতি)
৫. মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান। (রাজনীতি)
৬. জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা। (কূটনীতি)
৭. সোভিয়ত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা। (কূটনীতি)
৮. শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ (সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র)

শ্রেণির সবাইকে নিয়ে যখন দল ভাগ করা হচ্ছে তখন দীপঙ্কর ও অন্বেষা জানতে চাইল, কোন দল কোন বিষয়ে কাজ করবে সেটা কীভাবে ঠিক করা হবে?

খুশি আপা হেসে বললেন, আবার কীভাবে, সবাই মিলে আলোচনা করেই ঠিক করব, কারও যদি মনে হয় বিষয়টা কঠিন, তাহলে আমরা সবাই তাদের সাহায্য করব। এর মধ্যে শিহান একটা জটিলতার কথা তুলে ধরল। বলল, বায়ান্ন বছর আগেকার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কি সহজে পাওয়া যাবে?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে যখন তখনই মিলি বলল, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই বয়স্ক আত্মীয় বা বয়স্ক প্রতিবেশীর সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যাবে। যাঁরা অন্তত কৈশোরে এ যুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বা জেনেছেন।

তারপর সবাই মিলে তথ্যের উৎস নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু করল। তাতে বিভিন্নজন সম্ভাব্য বিভিন্ন উৎসের কথা বলেছে, যেমন

- বয়স্ক আত্মীয় বা প্রতিবেশী বা পরিচিত ব্যক্তি
- পাঠ্য বই
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই

- স্থানীয় লাইব্রেরি
- তখনকার পত্রপত্রিকা
- স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিভিন্ন প্রকাশনা
- ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট
- গুগল

এবারে কাজ কীভাবে করা যাবে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করল শ্রেণির সবাই মিলে। তারা প্রথমে দল ভাগ করবে, তারপর তৈরি করবে দলভিত্তিক কাজের নিয়মাবলি।

দলভিত্তিক কাজের নিয়ম-নীতি:

১. দলের সক্ষমতার ধরন নির্বিশেষে সবার জন্যে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি
২. দলের প্রত্যেকের মতামতকে মূল্য দিয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন,
৩. নিজের মতামত নির্দ্বিধায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ
৪. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা নিজের ভিন্নমত প্রদান
৫. সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণ
৬. দীর্ঘ কাজে কোনো লাইব্রেরি বারবার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেভাবে অনুমতি গ্রহণ
৭. কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই, ছবি বা অন্য কোনো নথি ব্যবহার করতে হলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ
৮. ব্যবহৃত সব দ্রব্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথা সময় ফেরত দেওয়া
৯. দলের সব সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
১০. কাজটি তথ্যে ও বিন্যাসে যেন সমৃদ্ধ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান

বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

আজ খুশি আপা জানতে চাইলেন যে এই অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যেসব ঘটনা ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? এর উত্তরে সবাই মিলে যা বলল তা একটা তালিকা করলে দাঁড়ায় বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদি। সবাই মিলে আলোচনা করে তখন ঠিক করল যে সবগুলো দল প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করবে এবং তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা, অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলি খুশি আপার সাথে আলোচনা করবে।

বই পড়া ক্লাব গঠন

মিলি বলল, আপা আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে তো বই পড়া ক্লাব করেছিলাম। এখন এসব বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিতে পারি।

কনক বলল কিন্তু আমাদের বই পড়া ক্লাবের মেয়াদ তো শেষ। তাহলে আবার ক্লাবের নির্বাচন করে পুনরায়

কমিটি গঠন করতে হবে।

তখন ওরা সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠনের পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনরায় বই পড়া ক্লাব গঠন করল। ক্লাব গঠন শেষ হলে প্রথম দিন থেকেই ওরা বই পড়া ক্লাবের কাজের ধরন এবং পুনরায় সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করল।

তথ্যের সন্ধানে:

কাজটা শুরু করতে হবে তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্যের সম্ভাব্য উৎসগুলোও জানা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আরও নতুন কোনো কোনো উৎসও পেয়েছে। কিন্তু কাজটা শুরু করবে কীভাবে?

নন্দিনী ও গণেশ একই দলে। এক ছুটির সকালে গণেশ নন্দিনীদের বাসায় এসে হাজির। বলল সত্যি কাজ কীভাবে শুরু করব সেটা নিয়ে ভেবে কিন্তু কূল পাচ্ছি না। নন্দিনীও বলল, হ্যাঁ, একদম শূন্য থেকে শুরু করা বেশ মুশকিল। নন্দিনীর বাবা তখন ওখানে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। উনি স্থানীয় কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। বললেন, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। আসলে যে বিষয়ে তোমরা কাজ করবে প্রথমে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বই পড়বে, নির্ভরযোগ্য লেখকের নির্ভরযোগ্য বই। অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে ইতিহাসটা শুনবে।

গণেশ বলল, চাচা, আপনি মনে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য শব্দটার ওপর জোর দিচ্ছেন খুব। কেন?

নন্দিনীর বাবা বললেন হ্যাঁ, মুশকিল হয়েছে অনেকেই বই লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু তথ্যগুলো ভালোভাবে যাচাই করে নেন না। কিছু কিছু ভুল থেকে যায়। তাই তোমাদের নির্ভরযোগ্য বই বা ব্যক্তির কথাই বলছি।

তখন নন্দিনী বলল তো আব্বু, তুমি তো ইতিহাস পড়াও, আবার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখিও করো। বাসায় তোমার সংগ্রহে তো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক বই আছে। তুমিই এক দিন আমাদের বলো না কেন মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সাংবাদিক, দেশ-বিদেশের আরও মানুষের ভূমিকা আর অবদানের কথা।

এ সময় গণেশ বলল, চাচা, আপনি দুদিন বললে ভালো হবে। এক দিন বলবেন মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে। আরেক দিন বলবেন এতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও পক্ষের ভূমিকা, অবস্থান ও অবদান নিয়ে।

শুনে নন্দিনীর বাবা বললেন, ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাদের স্কুলে যাব।

অমনি গণেশ যোগ করল তাহলে চাচা আমরা এক দিন ক্লাসে আসার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাব।

নন্দিনীর বাবা অধ্যাপক আজিজুল হক একটু ভেবে বললেন, ঠিক আছে। শুনে ওরা দু'জন হৈ হৈ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

অধ্যাপক আজিজুল হক সেদিন গণেশ-নন্দিনীদের যেসব কথা বলেছিলেন তা এবার তোমরা সবাই জেনে নিতে পার।

মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

তোমরা তো জানো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের মানুষ তখন স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই ইতিহাস তোমরা অনেকটাই জানো। এ রকম একটা যুদ্ধ আমাদের একার পক্ষে জেতা খুব কঠিন হতো। পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল থেকেছে কারণ আমরা বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছিলাম। এটা ঠিক যে কিছু দেশ আমাদের বিরুদ্ধেও ছিল।

স্বাভাবিক মিত্র ভারত: শরণার্থীর ঢল:

১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে এদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা শুরু করেছিল তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে প্রথমে হাজার হাজার ও পরে লাখ লাখ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। বিদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী এই মানুষদেরই বলা হয় শরণার্থী। তারা মূলত আমাদের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। তবে পূর্ব দিকের ত্রিপুরা রাজ্যও হয়ে উঠেছিল একটি বড় আশ্রয়কেন্দ্র। উত্তর-পূর্বের মেঘালয় রাজ্যেও কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। অল্প কিছু মানুষ মিয়ানমারেও আশ্রয় নেন। মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতের রাজধানী দিল্লি রাজনৈতিক কারণে, কলকাতা বাংলাদেশ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে এবং আগরতলা শরণার্থীদের বড় অংশের ট্রানজিট ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ক্যাম্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তখন বাস্তবতাই প্রতিবেশী ভারতকে বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্ত করে নিয়েছিল। এই যোগ ছিল বহুমাত্রিক।

যুদ্ধের পুরো নয়মাস জুড়েই ভারতের দিকে শরণার্থীর ঢল বহমান ছিল। ভারত সেদিন শরণার্থীদের জন্যে সীমান্তের সব পথ খুলে দিয়েছিল, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের খাবার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করেছিল। নয় মাসে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটি। মনে রেখো, তখন দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি।

রাজনৈতিক সংযোগ:

তোমরা তো জানো ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিজ বাড়িতে গ্রেপ্তার বরণ করার আগে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রাম যেন এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাজউদ্দীন প্রথমে কয়েক দিন আত্মগোপনে থেকে দলের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। পাকিস্তানি আক্রমণের প্রায় পরপর ৩১ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে সে দেশের পার্লামেন্ট লোকসভায় বাংলাদেশের অনুকূলে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় 'আমাদের সীমান্তের এত কাছে যে ভয়াল মৃতুর ঘটনা ঘটছে তার প্রতি এই সংসদ উদাসীন থাকতে পারে না। এই সংসদ প্রত্যয়ের সাথে তাদের জানাতে চায় যে তাদের (বাংলাদেশের জনগণকে) সংগ্রাম ও ত্যাগ ভারতের জনগণের সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে। ' আর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্টকে এক চিঠিতে জানান, 'বাংলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের শোষণ ও অবমাননাকর আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ভেবে আর চুপ থাকা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিবেচনায় এখানে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ' এই অবস্থায় যখন তাজউদ্দীন ও তাঁর সঙ্গীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। তখন তাঁর কাছ থেকে সহায়তার আশ্বাস পেতে দেরি হয়নি। তাজউদ্দীন যেসব বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছিলন সেগুলো হলো মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতা, প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত অস্ত্র সহায়তা এবং শরণার্থীদের জন্যে সব রকম মানবিক সাহায্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীরপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে তাজউদ্দীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। ভারত সে কাজেও সহযোগিতা দেয়। তোমরা জানো যে সরকার গঠিত হয়েছিল বর্তমান মুজিবনগর, তৎকালীন কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। তবে সরকারের দপ্তর ছিল কলকাতায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও চট্টগ্রাম, আগরতলা হয়ে কলকাতায় স্থাপিত হয়। এই সময় ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ছিল লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সরকারও ছিল তাদের। তবে লোকসভায় সক্রিয় ছিল আরও কয়েকটি দল- ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিআই), ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট), ভারতীয় জনতা দল ইত্যাদি। ইন্দিরা গান্ধী সবার মতামত নিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে একটি শক্তিশালী সর্বসম্মত রাজনৈতিক অবস্থান নেন। এতে বাংলাদেশের জন্যেও কাজ করতে বিশেষ সুবিধা হয়।

সামরিক সহযোগিতা:

ভারত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে শরণার্থী শিবির খোলার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও গোলাবারুদসহ প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল। এভাবে ভারতের সামরিক বাহিনীও বাংলাদেশের সংগ্রামে যুক্ত হয়ে যায়। তারা গেরিলা যোদ্ধা, নিয়মিত বাহিনীর নতুন সদস্য, নৌ কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদেরও ব্যবস্থা করেছে। আমাদের নিয়মিত বাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধের সময় দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে আক্রমণে সাহায্য করেছে। আর শেষে যৌথভাবে মিত্রবাহিনী গঠন করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রায় চার হাজার ভারতীয় সৈন্য শহীদ হয়েছেন। এভাবে ভারত প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সর্বাত্মক সহযোগিতা:

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী কেবল অর্থনৈতিক চাপ নয় স্থানীয় সমাজেও অনেক রকমের চাপ তৈরি করেছিল। যদিও শরণার্থীদের জন্যে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও উন্নত দেশ সহায়তা দিচ্ছিল তবু এর মূল চাপ নিতে হয় ভারতের সরকার ও জনগণকে। আদতে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা ছিল সর্বাত্মক। তাদের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন শরণার্থী শিবির নির্মাণ, ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দিয়েছে। তাদের জনগণ শরণার্থীদের জন্যে বাড়তি করও দিয়েছেন। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিকরা গঠন করেছিলেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। এর সভাপতি ছিলেন কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় অঙ্গনেও বহু মানুষ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মানবতাবাদী নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের মিত্রদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন নারী সংগঠন, খেলোয়াড়দের সংগঠন ইত্যাদি সমাজে সব অংশই সেদিন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কাজে যুক্ত হয়েছিল। এ ধরনের নানা উদ্যোগ সারা বছরই চলেছে।

আঞ্চলিক রাজনীতির তখনকার হালচাল:

আমরা তো জানি যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় দেশ ভাগ করে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান ও ভারতকে স্বাধীনতা দিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের ঘটনা - পাকিস্তান সে বছর ১৪ আগস্ট ও ভারত ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল।

পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যে দাবি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তুলে ধরেছিল তারই বাস্তব রূপায়ণ। ফলে এর শাসকরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে। অপরদিকে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার চেয়েছে দেশকে সব ধর্মের ও মতামতের মানুষের আবাসভূমি হিসেবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকেই দুটি দেশের আদর্শ ছিল ভিন্ন। তাছাড়া পাকিস্তান দীর্ঘকাল উপমহাদেশের অঙ্গ হিসেবে থাকার পরে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতে গিয়ে হিন্দু ও ভারত বিরোধিতার রাজনীতি শুরু করেছিল। তোমরা শুনলে অবাক হবে, আমাদের ভাষা আন্দোলনকেও তারা হিন্দু ও ভারতীয় চরদের কারসাজি ও ষড়যন্ত্র বলে প্রচার চালিয়েছিল।

এর বাইরে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিবেশী হিসেবে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে চীনেরও প্রভাব ছিল। একসময় চীন-ভারত খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পরে দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে মতবিরোধ হয়। যা ১৯৬২ সালে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। এরপর থেকে এই দুই বড় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা একপর্যায়ে ভারতের বদলে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এদিকে ভারত বিশ্বরাজনীতিতে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখতে চাইলেও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গভীর সম্পর্কে জড়ায়। পাকিস্তান শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একাধিক সামরিক চুক্তি এবং বিভিন্ন সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বরাজনীতির তখনকার হালচাল:

সেই সময় বিশ্বের দুটি প্রধান শক্তিধর দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। বলা যায়। ১৯৮০ পর্যন্ত এই দেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন বা দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে সেসব দেশের আত্মসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় এবং এটি ভেঙে ইউরোপ ও এশিয়ায় অনেক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মনে রেখো আমরা বলছি ১৯৭১ সনের কথা যখন এদেশটিও যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তিধর দেশ।

তখন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হতো পরাশক্তি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী দেশগুলো ও এশিয়ার জাপান আর অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা জোটবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে দুটি শিবির বা মেরুতে যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও ষাটের দশকের গোড়াতেই তাদের আদর্শগত ও কৌশলগত বিরোধ তৈরি হয় তৈরি হয়সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। তাই তারা ছিল এই দুই মেরুভিত্তিক বিভাজন থেকে দূরে। তখন বাকি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে বলা হতো তৃতীয় বিশ্ব।

এ পর্যায়ে আমাদের আরেকটু জানতে হবে সৌদি আরবসহ সেই অঞ্চলের মুসলমান প্রধান দেশগুলো সম্পর্কে। এ দেশগুলো প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর থেকে স্বাধীন হলেও অধিকাংশ দেশেই চলছিল রাজতন্ত্র বা একনায়কের শাসন। আদতে এই শাসকদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স। গোত্রভিত্তিক সমাজে তখন আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা তেমন প্রবেশ করেনি। শাসকরা প্রথম বিশ্বের তোষণ এবং ইসলামের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের নীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিল। মুসলমান প্রধান এবং মার্কিন বলয়ের ঘনিষ্ঠ দেশ হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব ছিল এসব দেশের।

১৯৫০-এর দশকজুড়ে উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে একে একে মুক্ত হয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ আর সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন ও আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সারা বিশ্বের তরুণ এবং সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ১৯৫৯ সালে কিউবায় ঘটে যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব এবং এর দুই নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা সারা বিশ্বের তরুণসমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন। বিশ্বরাজনীতির এই বাস্তবতার মধ্যে ষাটের দশকজুড়ে আমাদের দেশের মানুষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে গেছে, যা ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে এক দাবি স্বাধীনতায় এসে পৌঁছায়। এই প্রেক্ষাপট মনে রাখলে মুক্তি সনদ ছয় দফায় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপট নিশ্চয় বোঝা কঠিন হবে না।

নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ:

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে আমাদের আরও একটি উদ্যোগের কথা জানতে হবে।

১৯৬১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ আহমদ সুকর্ণ, মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের, ঘানার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রেসিডেন্ট কোয়ামে এনক্রুমা এবং তৎকালীন যুগোশ্লোভিয়ার (বর্তমানে বহু দেশে বিভক্ত, যেমন বসনিয়া, সার্বিয়া, মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ইত্যাদি) প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রজ টিটো প্রমুখ মিলে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ তৃতীয় পথ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। সেটি তখন সফলও হয়েছিল। এটির নামকরণ হয়েছিল নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট (NAM) বা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। এটি একটি জোট। ষাট ও সত্তরের দশকে বিশ্বরাজনীতিতে এই জোট ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বশেষ ১২০টি দেশ এর সদস্য ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো গণ্য হতো তৃতীয় বিশ্ব নামে। প্রথম বিশ্ব পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক উন্নত পশ্চিমা দেশগুলো, দ্বিতীয় বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। তবে এখন এভাবে আর বলা যায় না, কারণ বাস্তবতা পাল্টে গেছে।

ভারত ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দেশ। আর পাকিস্তান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশ। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে দু'দেশের অবস্থানের পার্থক্য নিশ্চয় তোমাদের কাছেও পরিষ্কার।

বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধ:

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এই সমীকরণের প্রভাব পড়েছিল। দেখা গেল ভারত যখন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে তখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো দুই শক্তিধর

দেশের অবস্থান ছিল তার বিপক্ষে। তবে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মেনি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা জাপানের মতো যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী অনেক মিত্র দেশ ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানের অমানবিক নিষ্ঠুরতার কারণে বাংলাদেশ ইস্যুতে অনেকটা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। আমাদের সরকারও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মিত্র বাড়ানোর তৎপরতা চালিয়ে গেছে। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সর্বাত্মক প্রয়াস ছিল অতুলনীয়। দেশের অভ্যন্তরে তিনি সব রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির ঐক্য গঠনে সফল হয়েছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সব প্রভাবশালী দেশ সফর করে তাদের কাছ থেকে মানবিক সহায়তা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সমর্থন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সহায়তা বন্ধে সম্মত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধেও সমর্থন আদায়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। বাংলাদেশে পাকিস্তানের নির্মম অমানবিক হত্যাযজ্ঞের চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে বাংলাদেশ সরকার ও তাঁর প্রয়াসের কারণে অনেক দেশই শরণার্থীদের জন্যে মানবিক সহায়তার কাজে অংশ নিয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ ইস্যুতে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব শক্তির অবস্থান অনেকাংশেই বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল। বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরীকে সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন আদায়ে কাজ করার জন্যে।

তবে একথা মানতে হবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের দামাল যোদ্ধারা অকুতোভয় ভূমিকা পালন করায় এবং সারা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে থাকায় হানাদার বাহিনীর পক্ষে কিছুতেই সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের যোদ্ধারা জীবনপণ লড়াই করায় এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে।

মিত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন:

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের অনুকূলে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুবার তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। ভেটো ক্ষমতা কেবল পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের রয়েছে। এ ক্ষমতার ফলে তারা এককভাবে অন্যদের সম্মিলিত প্রস্তাবও ঠেকিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবকটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন। তোমাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে বিশ্বের কোন ৫টি রাষ্ট্র এমন ক্ষমতাধর। সেই দেশগুলো হলো - চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে যেন প্রতিপক্ষকে জানান দিল যে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করলে তারা চুপ থাকবে না, বন্ধুরাষ্ট্রের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। এ সত্ত্বেও ডিসেম্বরে যখন পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায় ও দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় তখন সবার ধারণা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে বঙ্গোপসাগরে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ সপ্তম নৌবহর পাঠাবে। আর চীন হিমালয়ের দিকে থেকে ভারতে আক্রমণ চালাবে। তবে সোভিয়েত হুঁশিয়ারি ও সহায়তা এবং ভারত-বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর তৎপরতায় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি বলে তারা কেউই পাকিস্তানের পক্ষে কোনো রকম সামরিক তৎপরতা চালাতে পারেনি। বরং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপর ৬ ডিসেম্বর একই দিন প্রথমে ভূটান ও তারপরে ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ বিজয়ের আগেই আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আসতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্বসমাজ: সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধের আরও একটি দিক আমাদের জানা জরুরি। বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন থাকলেও সব দেশের জনগণের মধ্যে ছিল বিপুল সমর্থন ও গভীর সহানুভূতি। একেবারে শুরু থেকেই এমনটা ঘটার কারণ পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের আকস্মিকতা, নির্বিচার হত্যা এবং অপ্রস্তুত নিরীহ মানুষের ওপর বেপরোয়া আক্রমণ যে কোনো মানুষকে দু:খ দিয়েছে, ক্ষুব্ধ করেছে।

পঁচিশে মার্চের সেই কালরাতে অপারেশন সার্চলাইট শুরুর আগে পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা ঢাকায় অবস্থান করে নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালি নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা বৈঠক চালাচ্ছিল। বৈঠকের হালচাল ও অগ্রগতির খবর নেওয়ার জন্যে তখন দেশি-বিদেশি বহু সাংবাদিক ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তান সরকারের উচ্চমহল সে রাতের অভিযানের কথা গোপন রেখে নিজেরা নীরবে সন্ধ্যার মধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং সব বিদেশি সাংবাদিককেও দেশত্যাগে বাধ্য করেন। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে লুকিয়ে কীভাবে খবর সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা পরে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে তথ্য তোমরা আগেই জেনেছ।

তবে গণমাধ্যমে এর চেয়েও বড় চমক ঘটিয়েছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস নামে এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের প্রতিবেদন। অপারেশন সার্চলাইটের নেতিবাচক ধারণা মুছতে পূর্ব পাকিস্তানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক চলছে তা প্রমাণ করার জন্যে গভর্নর টিক্কা খান এক দল পাকিস্তানি সাংবাদিককে এপ্রিল মাসে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। সফরের সময় খোদ সামরিক কর্মকর্তাদের মুখেই শোনা গেছে তাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের কথা। তাছাড়া নানা জায়গা ঘুরে ম্যাসকারেনহাস আসল ঘটনা বুঝতে পেরেছিলেন। অন্যরা করাচি ফিরে পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী বানোয়াট খবর ছাপালেও ম্যাসকারেনহাস তা পারেননি। তাঁর বিবেক এমন কাজে সায় দেয়নি। তিনি প্রথমে অসুস্থতার কথা বলে খবর লেখা থেকে বিরত থাকেন। তারপর বোনের অসুখের কথা বলে তাঁকে দেখতে লন্ডন চলে যান এবং সেখানে লন্ডনের প্রভাবশালী পত্রিকা সানডে টাইমসের সম্পাদক হ্যাঁরল্ড ইভান্সের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বলেন। এ ভদ্রলোক আগেই এ ঘটনার কথা শুনেছিলেন বলে ম্যাসকারেনহাসকে আস্থায় নেন। খবরটি ছাপানো হলে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিপদ হবে বলে তিনি একটু সময় নেন। দেশে ফিরে ম্যাসকারেনহাস পরিবারকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তখন পাকিস্তানের নাগরিকদের বছরে একবারের বেশি বিদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তিনি পেশোয়ারে এসে পায়ে হেঁটে দুর্গম সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছান। তারপর সেখান থেকে প্লেনে আসেন লন্ডনে। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর ৯ হাজার শব্দের বিস্ফোরক খবর। শিরোনাম ছিল এক শব্দে–'গণহত্যা'। সম্পাদক ইভান্স লেখেন ছোট্ট নিবন্ধ - 'হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করো'। ম্যাসকারেনহাসের এই প্রতিবেদন বিশ্বের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং জনগণকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এটি যেন মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ ঠিক করে দেয়।

দেখা গেল এভাবে আরও কয়েকজন সাংবাদিক ভেতরের খবর বাইরে পাঠাতে সক্ষম হন। দেশের ভেতর থেকে বাংলাদেশি সাংবাদিকরাও বিদেশে খবর পাঠিয়ে গেছেন পুরো নয় মাস। এঁদের মধ্যে শহীদ নিজামুদ্দীন আহমেদ ও সৈয়দ নাজমুল হক বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করতেন। তাঁরা দু'জন এবং আরও অনেকেই ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হিসেবে আলবদরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তবে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের পাঠানো ছবি ও খবর বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছিল। ফলে প্রথম থেকেই সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষের সমর্থন আমাদের পক্ষেই তৈরি হতে থাকে।

গণমাধ্যম ও জনপ্রতিনিধি:

পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের পরে বাংলাদেশের যেসব সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক আগরতলা বা কলকাতায় পৌঁছান তাঁরাও ভারত ও অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের কাছে দেশের ভেতরের প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করেন। ফলে প্রথম থেকেই ভারতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং শরণার্থীদের খবর প্রচার করে এসেছে। ইংল্যান্ডের বেসরকারী বেতার কেন্দ্র বিবিসি, মার্কিন বেতার কেন্দ্র ভোয়া, ভারতের আকাশবানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি নয় মাসজুড়েই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সাফল্যের খবরও পরিবেশন করেছে। এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে শরণার্থী শিবিরে লাখ লাখ মানুষের কষ্টকর জীবন, অসহায় মৃত্যু, খাদ্যাভাবে অপুষ্টির শিকার শিশুদের অসহায় দুর্ভোগের বিবরণী ও ছবি প্রভৃতি।

দেখা গেল খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনপ্রতিনিধিরাও দলে দলে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে আসছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের দু:খ-কষ্টের সমব্যথী হচ্ছেন ও অনেকেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, স্যাক্সবি, গ্যালাঘ এবং ব্রিটিশ এমপি জন স্টোনহাউজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এদিকে ফ্রান্সের সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী, বিশিষ্ট লেখক আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর বন্দর ঘেরাও করেন সাধারণ মার্কিন নাগরিকরা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে দেবেন না। তাঁদের বাধা সেদিন উপেক্ষা করা যায়নি।

বিশ্বের খ্যাতিমান সব পত্রিকা ও সাময়িকীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে খবর, ফিচার ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত সাময়িকী টাইম ও নিউজউইকে একাধিকবার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রচ্ছদ কাহিনী হয়েছিল, একবার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। সেই সময় কিছু সাংবাদিকের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরেছিল যেমন– সাইমন ড্রিং, ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, পিটার হেজেলহার্স্ট, সিডনি শ্যানবার্গ, অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, মার্ক টালি,উইলিয়াম ক্রলি, ভারতীয় আলোকচিত্রি রঘু রাই, কিশোর পারেখ প্রমুখ। প্রথম সারির ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান, ইকনোমিস্ট, স্টেটসম্যান, দি টাইমস, ফিন্যাসশিয়াল টাইমস প্রভৃতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো পত্রিকাসহ সারা বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকার ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে। বিশ্বজনমত তৈরিতে এটি বড় ভূমিকা রেখেছিল।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের অবদান:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভূমিকা গ্রহণে শিল্পী-সাহিত্যিকরাও পিছিয়ে থাকেন নি। বিখ্যাত ভারতীয় সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকর ও ব্রিটিশ গায়ক বিটলস্খ্যাত জর্জ হ্যাঁরিসন মিলে বাংলাদেশ যুদ্ধে সহায়তার জন্যে ১৯৭১-এর আগস্টের ১ তারিখ নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজন করেছিল কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। তাতে হ্যাঁরিসন এবং আরেকজন খ্যাতিমান মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজ বাংলাদেশ নিয়ে আবেগপূর্ণ গান গেয়ে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন। পন্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলী আকবর খান ও পন্ডিত আল্লা রাখার সেদিনের বাদন মানুষ আজও স্মরণ করে। পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই কনসার্ট সরাসরি উপভোগ করেছিল। এদিকে ভারতজুড়ে শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজবীরা নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার সপক্ষে

সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগও গঠিত হয়েছিল অনেকগুলো। শরণার্থী শিবিরে অসংখ্য শিশুর চরম ভোগান্তি ও মৃত্যু উন্নত বিশ্বের শিশুদেরও টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বাংলাদেশের জন্যে সহায়তা তহবিলে দানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অক্সফাম, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউনিসেফসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা শরণার্থীদের সহায়তায় নিরলস কাজ করে গেছে। তখন বাংলাদেশের পক্ষে অনেক বেসরকারী সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয়েছিল ফ্রেন্ডস্ অব বাংলাদেশ, আমেরিকান ফর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন, বাংলাদেশ ডিফেন্স লিগসহ অনেক প্রতিষ্ঠান। ইংল্যান্ডের অপারেশন ওমেগা, অ্যাকশন বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস্ প্রভৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছে।

ষাটজনের সাক্ষ্য:

বিশ্বের বিখ্যাত ষাটজন মনীষী প্রকাশ করেছিলেন টেস্টিমনি অব সিক্সটি - ষাটজনের সাক্ষ্য। এ হলো এমন ষাটজন খ্যাতিমান মানুষের বক্তব্য যাঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তানে যে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাদার তেরেসা, মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, বিখ্যাত সাংবাদিক ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, জন পিলজার প্রমুখ। মাদার তেরেসা সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন - 'আমি পাঁচ-ছয় মাস ধরে শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করছি। আমি এসব শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মরতে দেখেছি। সে কারণেই আমি পৃথিবীকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই পরিস্থিতিটা কত ভয়াবহ এবং কত জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য দরকার। '

আর মার্কিন গায়িকা জোয়ান বায়েজের কণ্ঠে নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁরই রচিত গানের কলি -

বাংলাদেশ বাংলাদেশ

যখন সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়

তখন বাংলাদেশের দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একদিকে বহু বিয়োগান্তক ঘটনা, অসংখ্য নিষ্ঠুরতা, ধ্বংস, হত্যা, রোগ, অপুষ্টি, মৃত্যু আর অন্যদিকে মৈত্রী, সেবা, সহানুভূতি, মানবতা, যুদ্ধ, বীরত্ব, ত্যাগ, বিজয় এবং বিজয়ের উল্লাস।

তবে বিশ্বমানবতা সেদিন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং তাই শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে আমরা অর্জন করতে পেরেছি স্বাধীনতা । আমাদের শ্যামল জমিনে রক্তলাল রঙে সূর্য উদিত হয়েছিল অমানিশার অন্ধকার কাটিয়ে।

অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ:

নন্দিনীর বাবার কাছ থেকে সব কিছু শুনে ওরা সাবাই যেন হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে উঠল। মুক্তিযুদ্ধের এদিকটি তারা আগে কখনও খেয়াল করেনি।

অন্বেষা মুগ্ধতা নিয়ে বলল, সত্যিই তো কত দেশ কত মানুষ কত কত প্রতিষ্ঠান আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন!

আদনান বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, এ নিয়ে আমাদের খুব ভালো কাজ করতে হবে। সবাই কিন্তু এ ব্যাপারে সিরিয়াস থাকব আমরা।

খুশি আপা ওদের মনোভাব দেখে খুশি মনে বললেন, তোমরা তো আগেই অনুসন্ধানের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছ, এবার প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে তা ঠিক করে ফেল।

ওরা আলোচনা করে অনুসন্ধনের প্রশ্ন ঠিক করল।

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপুল শরণার্থী কোথায় এবং কীভাবে আশ্রয় পেয়েছিল?

২. অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়েছিল?

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে কারা সাহায্য করেছিল?

এভাবে আমরা আরও প্রশ্ন তৈরি করব। প্রত্যেক দল নিজ নিজ বিষয়ভিত্তিক সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা, তথ্য প্রাপ্তির উৎসের তালিকা এবং প্রাপ্ত তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি লিখব।

এরপর ক্লাসের সব বন্ধুদের প্রতিটি দলের প্রত্যেকে প্রথমে নিজ পরিবার এবং পরে এলাকার অন্যান্য বয়স্ক মানুষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করল। দলের সব সদস্য তাদের প্রাপ্ত তথ্য একত্র করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করল। প্রতিটি দল খুশি আপার সাথে তাদের প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করল।

– খুশি আপা দলগুলোর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখলেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিলেন। কিন্তু কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোনো জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেওয়া) সহায়তা দিলেন।

– দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা, প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান, জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা, সোভিয়ত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ সম্পর্কে বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করল। এ বিষয়গুলো নিয়ে জানার চেষ্টা করল এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করে নিল।

– খুশি আপা সতর্কতার সাথে দলের প্রত্যেক সদস্যই পর্যায়ক্রমে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

– -খুশি আপা বারবার দলগুলোর কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবে তার ধারণা নিলেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। তবে দলগুলোর ওপর কোনো মতামত চাপিয়ে দিলেন না।

– -সবাই দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করল এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে খুশি আপা ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করল।

ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

– এই পর্যায়ে খুশি আপা জানতে চাইলেন, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমরা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছ সেগুলো কীভাবে তোমরা অন্যদের জানাতে পারো?

– সবাই দলে আলোচনা করে বিভিন্ন সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করল। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেওয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। খুশি আপা এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দিলেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন করলেন। খুশি আপার পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করল এবং কোনো জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করল।

– এবার খুশি আপা বললেন, বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন- ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস , ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনেও তোমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পারো। আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।

– এছাড়াও তোমরা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইয়ের প্রদর্শনী, বছরব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই পাঠ প্রতিযোগিতা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী (যেমন স্টপ জেনোসাইড, লিবারেশন ওয়ার, নাইন মান্থস্ টু ফ্রিডম প্রভৃতি), মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন ও প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক মঞ্চায়ন, মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ আয়োজনের মাধ্যমে তোমাদের আগ্রহ, উপলব্ধি ও দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারবে।

– সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে বন্ধুরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিবাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি/মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ

এরপর খুশি আপা মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছিল এসব বিদেশি বন্ধুদের স্মৃতি ধরে রাখার স্থায়ী কোনো উপায় করা যায় কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বললেন যে, প্রাপ্ত ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে তোমরা নিজ নিজ এলাকায় “শিক্ষার্থী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ” করতে পারো বা পুনর্নির্মাণের নকশা তৈরির পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে পারো/ তাদের নামে কোনো রাস্তা বা বিশেষ জায়গা করা যায় কি না তা ভাবতে পারো এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের (উপজেলা বা জেলা) সহযোগিতার আবেদন করতে পারো।

ডকুমেন্টেশন

সবশেষে দলগুলো দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিত রূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিত রূপ/খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) খুশি আপার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করল।